দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ॥ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

আবদুল মান্নান

গত ৬ নবেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ইনামুল হকের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া পুত্র নুরুল হুদা মোহাম্মদ মুসা নিজের মূল্যবান জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছে— একাত্তরের পরাজিত শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কেউই নিরাপদ নই। ঘটনার পিছনে অনেক ঘটনা থাকে যা সাধারণত লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। ডঃ ইনামুল হক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জিয়া পরিষদের সভাপতি। কলেজে অধ্যয়নকালে মুসাকে ছাত্র শিবির তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। মুসার মতো অনেক কোমলমতি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের কাজে লাগান হতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কুৎসা সংবলিত লিফলেট বিতরণের কাজে। কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে মুসা ছাত্র শিবিরের কার্যকলাপে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে ১৯৯১ সালে ছাত্রদলে যোগ দিয়েছিল। এখানেই মুসা হয়ত ভুল করেছিল। শিবিরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ইতালির অপরাধ চক্র মাফিয়া সিন্ডিকেটের মতো। সংগঠনে একবার প্রবেশ করলে সেখান থেকে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব। বের হলে বা হওয়ার চেষ্টা করলে মুসার মত করুণ পরিণতি প্রায় অনিবার্য।

বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আমলে বিগত প্রায় তিন বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি শিবিরের হাতে সম্পূর্ণভাবে জিম্মি। পূর্বের উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর সিরাজউদ্দীন শিবিরকে প্রকৃত অর্থে ক্লাসরুমে জ্ঞান চর্চায় পাঠাতে চেয়েছিলেন। সফল হননি। ১৯৯০ সালের পুরো সময়টা ছাত্র শিবির যখন সমগ্র ক্যাম্পাস জুড়ে নজিরবিহীন ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র প্রকাশ্যে ছাত্র শিবিরের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটিকয়েক বামপন্থী নামধারী শিক্ষকও এই তস্করদের পক্ষ নিয়েছিল। এরা উভয় পক্ষই এক অভিন্ন যুক্তি খাড়া করেছিল। শিবিরকে কমজোর করলে তো আওয়ামী পন্থী ছাত্রলীগই শক্তিশালী হবে! আওয়ামী লীগ ঠেকাও রাজনীতির এক অদ্ভুত ধারাবাহিকতা। নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী শিবিরের দাবি অনুযায়ী অবশেষে খোদ উপাচার্যকেই তার নিজ বিভাগে সরকার ফেরত পাঠালো ১৯৯১-এর ৩১ ডিসেম্বর। সাবেক উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন, দেশের আইন, সর্বোপরি সভ্যতার আইনকে সমুন্নত রাখতে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে ভয়াবহ নির্যাতন ভোগ করেছেন তা দিয়ে একটি হরর ফিল্ম বা কাহিনী নির্মাণ সম্ভব। তবুও তিনি পরাজয় মেনে নেননি। সে আমলেই রচিত হয়েছিল ১৯৯০-এর ২২ ডিসেম্বরের কালো দিবস। এই দিন ঘাতক ছাত্র শিবিরের ক্যাডারদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য শিক্ষক-কর্মচারী আর ক্লাস করতে আসা অগুনতি ছাত্র-ছাত্রী। এ দিনের সশস্ত্রের তাণ্ডবের শিকার হয়ে নিহত হয়েছিল পরিসংখ্যান বিভাগের মেধাবী ছাত্র মৃত্যুঞ্জয়ী ফারুকুজ্জামান ফারুক।

তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ ২২ ডিসেম্বরের ঘটনা তদন্ত করার জন্য একটি এক সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। দুর্ভাগ্য তার, দুর্ভাগ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের, দুর্ভাগ্য জাতির। সেই তদন্ত কমিটি ছিল একেবারেই একচোখা। রিপোর্ট প্রণয়নকালে রিপোর্ট প্রণয়নকারী সবাইকে অবাক করে দিয়ে ২২ ডিসেম্বরের ত্রাস সৃষ্টিকারী ঘাতক বাহিনীর কোন দোষই বস্তুতপক্ষে চিহ্নিত করতে পারেননি। প্রতিবেদন অনুযায়ী ঐ দিনের ঘটনার প্রকৃত খলনায়ক হচ্ছেন উপাচার্য স্বয়ং এবং তাকে সহায়তা করেছিলেন মুক্তবুদ্ধি চর্চাকারী শিক্ষকবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে আসা হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন তাঁর প্রজ্ঞা, বিচার-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা আর মেধা দিয়ে তদন্ত কমিটি রিপোর্টের অসারতার কথা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন। তদুপরি রিপোর্টটি তার কাছে পেশ করার আগেই জামায়াতপন্থী একটি পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতেই জামায়াত-শিবির চক্র হতে প্রচণ্ড রব উঠল এই পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্টের 'সুপারিশ' অনুযায়ী উপাচার্যকে সরাতে হবে। এ সময় সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে বিষয়টি নিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করার আমার সুযোগ হয়েছিল। এই মুহূর্তে সেই বৈঠকের বিস্তারিত আলোচনা সমীচীন হবে না। তবে তিনি সকল সিন্ডিকেট সদস্যের সামনে একটা বাক্য জোরগলায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করেছিলেন যা সকলের জানা উচিত। তিনি বলেছিলেন— তদন্ত কমিটির রিপোর্ট তো কোন আদালতের রায় নয়। এটা নিয়ে কেন এত হৈ চৈ? অথচ তার প্রত্যাশা অনুযায়ী হৈ চৈ থেমে থাকেনি। এই হৈ চৈ-এর মধ্যেই বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম প্রহরেই সরকার সাবেক উপাচার্যকে উনবিংশ শতাব্দীর একটি কালাকানুনের দোহাই দিয়ে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। আর চার বছর মেয়াদের জন্য নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য কয়জন? প্রশ্নটা কিছুটা বেখাপ্পা ঠেকতে পারে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য তো আইন অনুযায়ী একজনই হবেন। কথাটি যে বাস্তবে মোটেও সত্যি নয় তা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য তো একজন আছেনই। কিন্তু মূল ক্ষমতা ভোগ করেন অন্ততপক্ষে আরও চারজন। এরা হলেন ছাত্র শিবির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, উপাচার্যের নিজ বিভাগের একজন শিক্ষক যিনি সর্বক্ষণ উপাচার্যের দফতরে অবস্থান করেন এবং তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতির একজন নেতা। এরা কেউই কোন বিধিবদ্ধ পর্ষদের কোন সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও উপাচার্যকে সর্বক্ষণ নসিহত করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিচালনার ভার ঐ সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের ওপর ন্যস্ত যার ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রশাসন বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

বাইরের জগতে সব খবরাখবর প্রচারিত না হলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে এক শ্বেতসন্ত্রাসের হাতে সম্পূর্ণরূপে জিম্মি। এই সন্ত্রাস এমনিতে সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয় না। ছাত্র শিবির যাই করে তার মধ্যে একটা পেশাদারিত্ব আছে যা স্বীকার করতেই হবে। এদের প্রথম টার্গেট হলো হলে বসবাসরত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা। শিবির নেতাদের অনুমতি ছাড়া রাত আটটার পর হলে প্রবেশ সাধারণ নিরীহ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় অসম্ভব। এ সময় হলের গেট ও টেলিফোনের নিয়ন্ত্রণ শিবির কর্মীরাই গ্রহণ করে। একজন ছাত্র হয়ত পড়ালেখায় ব্যস্ত। এমন সময় দেখা যাবে, হয়ত একজন শিবির নেতা একজন বহিরাগতকে ঐ পড়ুয়া নিরীহ ছাত্রটির রুমে তার অনুমতি ছাড়াই রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগ হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকারের নিয়োগ শিবিরের তালিকা অনুযায়ী করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দ্বার সবসময় তাদের জন্য অবারিত।

একদল শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষকদের বহুরকমের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান। দুটো অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। প্রথমটি হচ্ছে ছাত্র শিবিরের আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে এরা ছাত্র-ছাত্রীদের নানা রকমের বিধিবহির্ভূত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পরবর্তীকালে তাদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করতে সচেষ্ট থাকেন। দ্বিতীয় অভিযোগটি অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ক। এই দুটো অভিযোগের সাথে বর্তমানে আরও একটি ভীতিকর আলামত যোগ হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দীর্ঘদিন শিবিরের দখলে থাকলেও পার্শ্ববর্তী জোবরা এলাকা এতদিন জামায়াত-শিবির বলয়ের বাইরে ছিল। বর্তমানে এই এলাকাকে করায়ত্ত করার জন্য তারা একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই এলাকার মানুষ সাধারণত নিম্নবিত্ত দিনমজুর। জামায়াত-নিয়ন্ত্রিত একটি বেসরকারী ব্যাংক ও ট্রাস্টের সহায়তায় এলাকার গরিব জনগণের মাঝে বিনামূল্যে রিক্সা, হালের বলদ, ঢেউ টিন প্রভৃতি জিনিস বিলি করার ব্যবস্থা জামায়াত-শিবির নিয়েছে এই শর্তে যে, প্রয়োজনে তারা জামায়াত-শিবিরের সকল কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের যত রকমের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় তা পুলিশ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এখানে কোন রাখঢাক নেই। গত ৬ নবেম্বর মুসার মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয় যখন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় তখন ৭ তারিখ ভোর রাতে সামনে-পিছনে পুলিশ প্রহরায় আটটি বাসের সাহায্যে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার দলকে অস্ত্রশস্ত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসন শহরে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। অথচ একই দিন বিকালে শহরে অনুষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এক সভায় সরকারের অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তি ঘোষণা দেন যে, জামায়াত-শিবিরকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। এখানে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এই নেতাদেরই কেউ কেউ চট্টগ্রামে জামায়াত-শিবিরের অঘোষিত আমিরের দায়িত্ব পালন করেন। কারণ নির্বাচনে জিততে হলে এই পরাজিত শত্রুদের সমর্থন তাদের খুবই প্রয়োজন।

মুসার অকালমৃত্যু অনেককে তুমুলভাবে নাড়া দিয়েছে। আগে এই ঘাতক বাহিনীর হাতে শিক্ষকরা লাঞ্ছিত-আহত হলেও কোন শিক্ষকের সন্তানকে তাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়নি। মুসা নিজের জীবন দিয়ে অনেক কিছুই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। তার পিতা নিজেকে যতই ক্ষমতাসীন দলের বা সংগঠনের নেতা বলে দাবি করুন তার একমাত্র প্রাপ্তি মৃত সন্তানের লাশের সামনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে

মুসার অকালমৃত্যু অনেককে তুমুলভাবে নাড়া দিয়েছে। আগে এই ঘাতক বাহিনীর হাতে শিক্ষকরা লাঞ্ছিত-আহত হলেও কোন শিক্ষকের সন্তানকে তাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়নি। মুসা নিজের জীবন দিয়ে অনেক কিছুই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। তার পিতা নিজেকে যতই ক্ষমতাসীন দলের বা সংগঠনের নেতা বলে দাবি করুন তার একমাত্র প্রাপ্তি মৃত সন্তানের লাশের সামনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি ছবি। ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে নিজের সংগঠনের চাইতে জামায়াত-শিবির তোষণই অনেক বেশি কাম্য। আর তা না হলে ১৯৯০-এর মর্মান্তিক ঘটনার পর ছাত্র শিবিরের কোন ঘাতককে শাস্তি না দিয়ে উল্টো সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শিবির কর্মীদের আইনের লাগাম পরানোর চেষ্টায় রত উপাচার্যকে তার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিতেন না।

ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা বর্তমানে অভিযোগ তুলেছে, মুসাকে হত্যা করার নীল নকশা ক্যাম্পাসেই জনৈক শিক্ষকের বাসায় রচিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালের ২৬ নবেম্বর তৎকালীন জাতীয় ছাত্র সমাজ নেতা আবদুল হামিদকে হত্যার উদ্দেশে আক্রমণ, তার ডান হাত কেটে নেয়ার মতো পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনাও ঐ একই শিক্ষকের বাসায় তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগসমূহ যদি সত্যি হয় তাহলে প্রমাণ হবে যে, কোন ছাত্রের মূল্যবান প্রাণই ক্যাম্পাসে বসবাসরত চাচাদের হাতে নিরাপদ নয়। অতএব সব ভাতিজারা সাবধান!

মুসা তার জীবন দিয়ে আরও প্রমাণ করেছে নতজানু, আজ্ঞাবাহী ও বশংবদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী প্রশাসন চালু করতে হবে এবং প্রশাসন যাতে ক্যাম্পাসে আইনের শাসন কায়েম করতে পারে সেজন্য তাকে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থের ওপরে উঠে সর্বপ্রকারের রাষ্ট্রীয় সহায়তা দিতে হবে। এটা কেবলমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রযোজ্য।

আবদুল মান্নান, অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষক, প্রবন্ধকার।